সাহিত্যতত্ত্ব — মূল বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব মূলতঃ স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সাহিত্যতত্ত্ব। অর্থাৎ সাহিত্যরচয়িতা সাহিত্য রচনা কালে সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে কিভাবে উন্মুক্ত করেন, পাঠকের কাছে পৌঁছাতে চান — সাহিত্য বলতে কি বোঝেন, — রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে - এবিষয়ক আলোচনা। বিপরীতে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের আলোচনা পাঠকের দিক থেকে। অর্থাৎ পাঠক কি ভাবে রসউপভোগ করেন, সাহিত্যের রস আস্বাদন করেন, কি ভাবে সাহিত্য উপলব্ধি করেন তাঁরা আলোচনা ~~করেছেন~~ এই দৃষ্টিকোণ থেকে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আসলে কবিত্বের রঙিন সুতো দিয়ে গাঁথা অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভাস।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ নির্দিষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন — সাহিত্যের সহজ অর্থ নৈকট্য বা সম্মিলন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জড়ের সঙ্গে চেতনের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন যে সংঘটিত হয় সাহিত্যের মাধ্যমে। অতীব সংস্কার থেকে বাধ্যত সঙ্গীহীন মানুষের পক্ষে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

মানবমনের দুই বিভাগের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'বড় আমি' আর 'ছোট আমি'। সাহিত্যের দ্বারা ছোট আমি = 'বড় আমি'-র মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ছোট আমি হচ্ছে Individual। কিন্তু সৃষ্টি করে 'Personality' — রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বড় আমি' বলেছেন। এই সত্তা প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র তুচ্ছতার থেকে ঊর্ধ্বে। সাহিত্যের মধ্যে জাগতিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার ঊর্ধ্বের এই আমির প্রকাশ। সাহিত্যিক যখন রচনা করেন তখন তিনি তাঁর Personality দিয়ে বাইরের সকল বিষয়কে অনুভবে জানেন। অনুভবের মধ্যে দিয়ে বাইরের বিষয়কে নিজের করে পান, তাঁর অন্তর সীমানা প্রসারিত হয় একই সঙ্গে প্রসারিত হয় তাঁর আনন্দের সীমানাও।

প্রয়োজনের দাবী অসংখ্য, বিশুদ্ধ সাহিত্যে অপ্রয়োজনের আনন্দ। মানুষ তার প্রয়োজনের দায়মুক্ত

সত্তা দিয়ে সাহিত্য কে সৃষ্টি করে এবং নিজেকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করে। এই আনন্দ সৌন্দর্যের আনন্দ, অপ্রয়োজনীয়ের আনন্দ। বিশ্বপ্রকৃতিকে অন্তরে উপলব্ধি করলে একটা সমগ্রতার আনন্দ অনুভূত হয়। সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিক সেই ঐক্যের আনন্দ, সমগ্রতার আনন্দ কে ব্যক্ত করেন। বাইরের জগতের গোলাপ-ই হোক বা নিছক সামান্য কলকারখানা, সাহিত্যিক যখন তাকে নিজস্ব অনুভূতির আলোকে দেখেন জানেন, সেই জ্ঞান জ্ঞানীর জ্ঞানের থেকে পৃথক হয়ে যায়।

মানুষ তার অপ্রয়োজনের দৌরাত্ম্য কে লাঘব করতে সেটার মধ্যে অপ্রয়োজনের ছোঁয়া দেয়। এই কারণে জল আনার ঘটে কারুকার্য করে ও মানুষ মারার প্রয়োজনে যুদ্ধের অস্ত্র তৈরী হলেও, সেই অস্ত্রে কারুকার্যের বাহার আনে। যুদ্ধ করলেই তার চলে না, যুদ্ধের বাজনা-ও বাজায়। প্রয়োজন কে অপ্রয়োজনের আনন্দ দিয়ে মুড়ে তাকে অনুভূতি বা উপলব্ধির জিনিস করে তোলে। এই অপ্রয়োজনের আনন্দেই সৌন্দর্যের প্রকাশ। মানুষ তার আপন অনুভূতিকে খুঁজে বেড়ায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। ফুলের বনে পায় ভালোবাসা কে, আকাশের নীলে পায় নীলাম্বরের লীলাকীর্তন, নবদূর্বাদল হয়ে ওঠে তার কাছে সবুজ সতেজ প্রাণের প্রতীক। প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় মানুষ হিসেবী কিন্তু উৎসবের আনন্দে মানুষ বেহিসেবী। সাহিত্যের মধ্যে মানুষের এই আনন্দ উদ্‌যাপন। যে যাকে খুব ভালোবাসি তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে সে যখন বলে— "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল"— তখন তথ্যের দিক দিয়ে নিতান্ত ভুল হলেও সত্যের দিক থেকে তা চিরন্তন হয়ে ওঠে। বিশ্বসাহিত্যে

সেরকম তথ্যের হিসাবে কল্পকাহিনীর ভুল হবার সম্ভাবনা না থাকলেও সত্যের হিসাবে তা তথ্যকে ছাপিয়ে ওঠে — তার কোন পরিমাপ থাকে না।

এই প্রবল অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গেলে ভাষাকেও শব্দার্থের সীমাকে লঙ্ঘন করতে হয়। এইজন্য 'চরনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' — বললে তাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না - প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যের প্রতি চরম আবেগই প্রকাশিত হয়। 'রস' মানেই বিশেষ রূপে আনন্দ। এই আনন্দ সকলের হৃদয়ে নিজের আবেগকে প্রতিফলিত হতে দেখার আনন্দ। প্রশ্ন ওঠে দুঃখবোধ কিভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে? দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, আমাদের চেতনাকে আলোড়িত করে তোলে, এই কারণে বাস্তবে মৃত্যু, কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতার উল্লাস আমাদের কাছে কষ্টদায়ক হলেও সাহিত্যে তার প্রকাশ — ~~আমাদের কাছে হলেও~~ পাঠক ও সাহিত্য রসিকতা উভয়ের মধ্যেই এক প্রবল আবেগের উপলব্ধি নিয়ে আসে এবং সে উপলব্ধির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আনন্দ লাভ। বেদনা দিয়েই অন্তরতম পুরুষ Personality-কে জানা যায়। অর্থাৎ individual বা ছোট আমি উপলব্ধি করে 'বড় আমি' কে। জীবনের শূন্যতাবোধ আমাদের যে ব্যথা দেয়, কিন্তু পরমপুরুষের উপলব্ধি মাত্র তা পূর্ণতার বোধকে জাগিয়ে তোলে — যার মানে নিবিড় অপার আনন্দানুভূতি।

শৈশবকাল থেকে মানুষ প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ উপভোগ করে আসছে। সৃষ্টিকর্তা যেমন সৃষ্টিকালে আপন খেয়ালে জীব-জন্তু রচনা করেছেন সাহিত্যে সাহিত্যিক সেরকমই আপন খেয়ালে নানা চরিত্র রচনা করেন, নানা ঘটনা সংগঠন করেন। জিরাফের কেন লম্বা গলা, উটপাখি কেন উটের মতো দেখতে নয় এই প্রশ্ন যেমন অবান্তর তেমনি সাহিত্য বিচার করতে বসে কোন চরিত্রের বাস্তবতা বিচার অবান্তর। পাঠক যা পাঠ করে আনন্দ পাবে, খুশি হবে সাহিত্য ক্ষেত্রে সেটাই বাস্তব — এ ব্যতিরেকে আর কোন মাপকাঠি সাহিত্য বিচারের জন্য প্রয়োজন নেই।

কেবলমাত্র সুন্দর কে নিয়েই সাহিত্যের কারবার নয়, সাহিত্যের কারবার মনোহর কে নিয়ে। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এক ধরণের সৌন্দর্য আছে যা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য – ইন্দ্রিয় দিয়েই উপলব্ধি করা যায়। আর এক ধরণের সৌন্দর্যে মন তার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে। সাহিত্যের কাজ এই মনোহরণ। যা কিছু বাস্তব তাকে হুবহু উপস্থিত করা হল সংবাদ ও কিন্তু সাহিত্য যখন সেই সংবাদকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করে তখন তা হয়ে ওঠে অদ্ভুতপূর্ব, স্বতন্ত্র। এই কারণে ভীষ্ম পিতৃস্নেহ বাস্তবে দুর্লভ না হলেও মহাভারতে স্বতন্ত্র অনন্য — মহাভারতের কাহিনীকারের তুলিতে স্বতন্ত্র মতই ধন্য হোন – বাস্তবে সে স্বতন্ত্র পাওয়া যাবে না। সেইরকমই দৈনন্দিন-ঘরের কন্যার বিবাহ হলেও উমা-শঙ্করের বিবাহ অনন্য হয়ে ওঠে কালিদাসের লেখনীতে।

মানব সমাজ নানাবিধ অব্যবস্থাতন্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন। মানব সমাজের নানারকম স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরকে। রাষ্ট্রশাসনের নিষ্পেষণে মানুষকে দেখা হয় সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করে কিন্তু সাহিত্য মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। সাহিত্যে ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মান ও সাহিত্যের মধ্যেই সে নিজেকে সত্যরূপে উপলব্ধি করে — সে রূপ আনন্দময়-দুঃখহীন। এই আনন্দময় রূপ সৃষ্টিতেই বিশ্বজোড়া মিলন এবং পরমপুরুষের নিবিড় উপলব্ধি।